ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ (১৯২২ - ২০০৯)

ভারতবর্ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চার আদিযুগে কণ্ঠসঙ্গীতের যতখানি আদর ছিল যন্ত্রসঙ্গীতের তা ছিল না। সুরযন্ত্র বাজাবার ধরনটিও ছিল এখনকার তুলনায় অনেক সাদামাটা। যন্ত্রসঙ্গীতের সমাদর হল বিংশ শতাব্দীতে এসে। তখন থেকে গুণগ্রাহী দেশীয় রাজাদের দরবারে কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় প্রকার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরই চর্চা হতে থাকে। সেই সময়ের কাছাকাছি, অর্থাৎ মোটামুটি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে তিন দেশীয় রাজ্যের দরবারে আমরা তিনজন অত্যন্ত গুণী যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীকে দেখতে পাই। তাঁরা হলেন গোয়ালিয়রে হাফিজ আলি খান (পুত্র - আমজাদ আলি খান), গৌরীপুরে এনায়েত খান (পুত্র বিলায়েত খান), (এবং মাইহারে আলাউদ্দিন খান (পুত্র আলি আকবর খান; শিষ্য ও জামাতা - রবিশঙ্কর)। এই তিন বাদক এবং তাঁদের পুত্র ও শিষ্যেরা মিলে যে সমৃদ্ধ ঘরানাগুলির সৃষ্টি করেছিলেন সেটাই বর্তমানে ধ্রুপদী যন্ত্রসঙ্গীতের সামগ্রিক চেহারা।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লায় এক গ্রামে আলি আকবরের জন্ম হয়। অতি শৈশবে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার সূত্রপাত। প্রথমে বাবার কাছে তালিম নেন কণ্ঠসঙ্গীতের; তারপর কাকার কাছে শেখেন তালবাদ্য; তারপর দিনকতক পিতৃবন্ধু হাফেজ আলি খানের কাছ থেকে নেন সরোদের প্রাথমিক পাঠ। এইভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নানা শাখায় সাধারণ জ্ঞান অর্জন করে নেবার পর তিনি বাবার তত্বাবধানে সরোদের উচ্চতর শিক্ষা শুরু করলেন।

খুব অল্প বয়সেই তিনি বড় বাজিয়ের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তের বছর বয়সে এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনে প্রথম একক বাদন। কুড়ি বছর বয়সে প্রথম রেকর্ড, একুশ বছর বয়সে যোধপুর রাজসভার শিল্পী; অনায়াস পারম্পর্যে এ সব ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে যায়। লোকে যাকে স্বীকৃতি ও সাফল্য বলে তাও এসে যায় সহজেই। বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশক হল তাঁর জীবনের সেই কর্মময় উত্থান যুগ। তখনও তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায় পৌঁছয় নি। তিনি ইহুদি মেনুহিনের মুগ্ধ আমন্ত্রণে আমেরিকায় গেলেন; পরে আরও নানা দেশে গেলেন। পৃথিবী জুড়ে গড়ে উঠল তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত ও ছাত্রের দল। শুধু বাদক নয়, শিক্ষক হিসাবেও তিনি হলেন খ্যতিমান। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতায়। পরে আমেরিকা ও সুইজারল্যান্ডেও এই কলেজের শাখা খুলেছিলেন। সানফ্রান্সিসকোর সেই আশ্রমতুল্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ইদানিং বেশিরভাগ সময় থাকতেন। সেইখানে গত ১৯শে জুন ২০০৯ ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সাতাশি বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হল।

আলি আকবরের এই জীবনপঞ্জীর তলায় তলায় নিশ্চয় আরও একটা জীবনকাহিনী ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী - তাঁর সাধনা ও সংগ্রামের ইতিহাস, তাঁর নিজস্ব চাওয়া পাওয়া ও মূল্যবোধের ইতিহাস, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার ইতিহাস, তাঁর আত্মিক ইতিহাস। দীর্ঘ জীবনে বিধাতা যেমন তাঁকে দুহাত ভরে দিয়েছেন তেমনি নিয়েওছেন অনেক কিছু। প্রিয়শিষ্য নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর মত নানা দুঃখ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। মধ্যবয়সে আসতে না আসতে কেন তিনি নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেলেন, কেন বেশি সময় বিদেশেই থাকলেন আমরা জানি না। এই নীচু সুরে বাঁধা, প্রচারবিমুখ, আত্মমগ্ন, নিভৃত জীবনের ইতিহাস নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে লেখা হবে। এখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ হঠাৎ যেন আমাদের একবার নাড়িয়ে দিয়ে মনে করিয়ে গেল যে একটা যুগের অবসান হতে চলেছে। যন্ত্রসঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম তিন যুগন্ধর, আলি আকবর, বিলায়েত, ও রবিশঙ্করের মধ্যে শুধু তৃতীয়জনই এখনও টিম টিম করে জ্বলছেন, অপর দুজন নেই।

সংবাদপত্র জানাচ্ছে আলি আকবরের মৃত্যুসংবাদ শুনে রবিশঙ্কর বলে উঠেছিলেন ''আলি ভাই এবারও আমাকে হারিয়ে দিয়ে গেল।'' আলি আকবর ও রবিশঙ্কর, একের কথায় অন্যের প্রসঙ্গ আসবেই। অতি তরুণ বয়স থেকে দুজনে প্রায় একই সঙ্গে আলাউদ্দিন খাঁর কাছে তালিম নিয়েছেন। প্রায় একই ধরনের দুটি তারযন্ত্রে দুজনের শিক্ষা হয়েছে। প্রায় এক পরিবারে সমান সুখদুঃখভাগী ভাইয়ের মত থাকতে থাকতে পরে আত্মীয় সম্বন্ধও স্থাপিত হয়েছে। আত্মীয়তা ভেঙে যাবার পরও কিন্তু বন্ধুত্ব ভাঙেনি। দুজনেই নতুন নতুন রাগ রাগিনী উদ্ভাবন করেছেন। প্রচলিত সুরবিস্তারের ছক ভেঙে নতুন ছক তৈরি করেছেন। ১৯৪৪ থেকে দুজনে সেতার সরোদের যে যুগলবন্দিগুলি বাজাতে শুরু করেছিলেন সঙ্গীতজগতে সে এক অভিনব জিনিস । সুরসৃষ্টির নানা নকসা ও চাপান উতোরের খেলায় যে চিত্তচমৎকারী দ্বন্দ্বযুদ্ধ রচিত হয়েছিল তা এখন ঘরে ঘরে বাজছে।

রবিশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন যেমন কর্মময় ও নাটকীয় ঘটনাবলীতে বর্ণময়, আলি আকবরের তা নয়। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সাধারণ সাংসারিক জীবন, একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন, গুটিকতক চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা (সত্যজিৎ রায়ের দেবী, তপন সিংহের ক্ষুধিত পাষান, বার্তোলুটির লিট্‌ল্ বুদ্ধ, চেতন আনন্দের আঁধিয়া প্রভৃতি), সঙ্গীত শিক্ষাদান, সঙ্গীতচর্চা এই তাঁর সারাজীবনের কাজ। বিশেষ একটি পানীয় এবং ডানহিল সিগারেট নিয়ে বসে থাকা, এই তাঁর প্রধান শখ। সঙ্গীত বোদ্ধারা বলেন রবিশঙ্কর বা বিলায়েত খানের মত নিজ নিজ যন্ত্রে ও সাবেকি বাজের সংস্কারসাধনেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এমন কি হস্তকৌশলের, বিশেষত : ডান হাতের হস্তকৌশলেও তাঁর তেমন মনোযোগ ছিল না। এতে তাঁর বাজনার ক্ষতি হতে পারত। কিন্তু হয়নি এই কারনে যে সেই সম্ভাব্য ক্ষতি তিনি পুষিয়ে নিয়েছেন উচ্চাঙ্গের সুরসৃষ্টির দ্বারা। তাঁর বাজনায় স্বরপ্রগতি যে কখন কোনদিকে বাঁক নেবে, কিসের পর কী আসবে তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত থেকে যায়। আকস্মিক কোনও আঘাতে তিনি একেবারে মর্মের ভেতরে গিয়ে ঘা দেন। অথচ এ নিয়ে অহঙ্কার দূরস্থান, কোনো সচেতনাও তাঁর ছিল না, কোনও মুগ্ধ শ্রোতা যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, কী করে এমন সুর লাগালেন, তাঁর আটপৌরে জবাব ছিল ''এত দিন ধরে রগড়াচ্ছি তো; ও হয়ে যায়। '' নীলাক্ষ গুপ্ত তাঁর এইরকম একজন শ্রোতা। তাঁর একটি পুরনো লেখা উদ্ধৃত করে উপসংহার টানি - ''যন্ত্রের প্রতিটি আওয়াজের মধ্যে তিনি এক মর্মস্পর্শী ক্ষমতা জাগাতে পারেন। ধরুন, তরফের তারগুলির মধ্যে দিয়ে একবার নখ চালিয়ে , চিকারি ইত্যাদিতে একটা ঘা দিয়ে, উদারার পঞ্চম আর মুদারার ঋষভ পর পর লাগালেন - তাতেই জলসা যেন কেঁপে উঠল। একবার তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ এই টোন তিনি কী করে বার করেন, বাজাবার কোনো কৌশল আছে কি? তিনি খালি বলেছিলেন 'এসব ভিতর থেকে আসে, ভেবে চিন্তে কিছু হয় না।' সত্যই আলি আকবর কোনোদিন কিছু ভেবেচিন্তে করেছেন বলে মনে হয় না। তিনি হাফিজ আলি খাঁ যাকে তাসীর বলতেন (অর্থাৎ ভগবানের আশীর্বাদ তাই নিয়ে জন্মেছিলেন।''

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান